যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ১৮-০৯-২০২২ (পৃঃ ১৩)

পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জিংকসমৃদ্ধ ধানের গুরুত্ব বাড়ছে

ইমরান সিদ্দিকী

বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও পুষ্টি নিরাপত্তায় রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার ফসল উৎপাদনে জোর দিচ্ছে। জিংকসমৃদ্ধ ধানের চাষ উৎসাহিত করতে বাংলাদেশের সরকার বিনা জামানতে ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে। আবহমানকাল ধরে ধানকে এ দেশের জাতীয় সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবেবিবেচনা করা হতো। বাংলাদেশে খাদ্যের নিরাপত্তা বলতে মূলত ধান বা চালের নিরাপত্তাকেই বোঝায়। খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ বর্তমানে উদীয়মান অর্থনীতির নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে- যা সম্ভবহয়েছে কেবল চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বা খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে।

মানবদেহ গঠনের একটি অতীবগুরুত্বপূর্ণ অনুপুষ্টি উপাদান হলো জিংক। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সে শতকরা ৪৪ ভাগ শিশু এবং ৫৭ ভাগ মহিলারা জিংকের অভাবেভুগছে। ১৫ থেকে ১৯ বছরের শতকরা ৪৪ ভাগ মেয়েরা এর অভাবেখাটো হয়ে যাচ্ছে। এর সমাধান খুঁজতে গিয়ে (বায়োফর্টিফিকেশনের মাধ্যমে) প্রধান খাদ্য ভাতের মধ্যে অধিক পরিমাণে জিংক সম্পৃক্ত করে নতুন নতুন জিংকসমৃদ্ধ ভাতের ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশে উদ্ভাবিত চালে ২৪ মিলিগ্রাম পর্যন্ত জিংক পাওয়া যায়, যা আপনার শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত জিংকের চাহিদা পূরণ করতে পারে। চালে অধিক পরিমাণে জিংক থাকা সত্ত্বেও এই ভাতের স্বাদ ও রংয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না।

উচ্চমাত্রায় জিংকের অভাবেমানুষ খাটো হয়। এছাড়া ক্ষুধামন্দা, ডায়রিয়া হয়। তাই বাংলাদেশে মানুষের এসবসমস্যা সমাধানে জিংক চাল ভূমিকা রাখবে। এই চালের ভাত খেলে মানুষের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। জিংক ধানের চাল থেকে দেশের মানুষের ৭৭ শতাংশ ক্যালরি ও ৫০ শতাংশ প্রোটিন আসে ভাত থেকে। প্রতিদিন গড়ে মাথাপিছু ৩৬৭ গ্রাম চালের ভাত আমরা খেয়ে থাকি। ভাত বা দানাদার খাদ্য মোট খাদ্যশক্তির ৬০ শতাংশের বেশি দখল করে আছে। অর্থাৎ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও খনিজ উপাদান আসে ভাত থেকে। চালে মোটামুটি ৮০ শতাংশ শর্করা, ৭.১ শতাংশ প্রোটিন, ০.৬৬ শতাংশ চর্বি, ০.১২ শতাংশ চিনি, ১.৩ শতাংশ আঁশ থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম চালে ১১৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ১১৫ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ২৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ২৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪.৩১ মিলিগ্রাম আয়রন পাওয়া যায় ।

মানবদেহের জন্য জিঙ্ক খুবপ্রয়োজনীয় একটি খনিজ উপাদান। মানবদেহের ৩০০টি এনজাইমের সঙ্গে জিঙ্ক সরাসরি অংশগ্রহণ করে যেগুলো দেহের অনেক বিপাকীয় কাজে অংশ নেয়। জিঙ্কের অভাবেমুখের রুচি নষ্ট হয়, স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয়, ওজন কমে যায় অথবা মুটিয়ে যায়, চুল পড়ে যায়, হজমে সমস্যা হয়, জটিল ধরনের অবসাদগ্রস্ততা দেখা দেয়, বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়, হরমোনের সমস্যা হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, মনোযোগ ও স্মরণশক্তি কমে যায়, ত্বকের ক্ষত সারতে দেরি হয় এবং স্নায়ুবিক দুর্বলতা দেখা দেয়। মানবশরীর জিঙ্ক সংরক্ষণ করে রাখতে প্রতিদিনই একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ১১ মিলিগ্রাম এবং নারীদের ৮ মিলিগ্রাম জিঙ্ক গ্রহণ করতে হয়। গর্ভবতী মায়েদের দৈনিক ১১ মিলিগ্রাম, দুগ্ধদানকারি মায়েদের ১২ মিলিগ্রাম জিঙ্ক প্রয়োজন এবং শিশুদের দৈনিক চাহিদা ৩ থেকে ৫ মিলিগ্রাম জিঙ্ক।

লাল মাংস জিঙ্কের ভালো উৎস। ১০০ গ্রাম গরুর মাংসে ৪.৮ মিলিগ্রাম জিঙ্ক থাকে- যা দৈনিক চাহিদার শতকরা ৪৪ ভাগ মেটায়। ১০০ গ্রাম ছোট চিংড়ি দৈনিক চাহিদার শতকরা ১৪ ভাগ মেটায়। ১০০ গ্রাম রান্না করা ডাল মেটাতে পারে চাহিদার মাত্র ১২ শতাংশ। বাদামে প্রচুর জিঙ্ক আছে। ২৮ গ্রাম বাদাম চাহিদার ১৫ শতাংশ, পনির ২৮ শতাংশ, এক কাপ দুধ ৯ শতাংশ এবং একটি ডিম শতকরা ৫ ভাগ জিঙ্কের চাহিদা মেটাতে পারে। মাংস, ডিম, দুধ, পনির, বাদাম, চিংড়ি দামি খাবার হওয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে। লাল মাংস ও চিংড়িতে কোলেস্টেরল বেশি থাকায় বয়স্ক জনগণ সাধারণত ডাক্তারের পরামর্শে এসবখাবার এড়িয়ে চলেন। তাই মানবদেহের জন্য সবচেয়ে উপকারী হচ্ছে জিংকসমৃদ্ধ ভাত। খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টির জোগান নিশ্চিত করতে দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবেকাজ করে যাচ্ছেন। যার ফলে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা

ইনস্টিটিউট বেশ কয়েকটি জাতের জিঙ্কসমৃদ্ধ ধান ও গমের জাত উদ্ভাবন করেছেন। উদ্ভাবিত জিঙ্কসমৃদ্ধ জাতগুলোতে প্রতি কেজি চালে ২২ থেকে ২৭ মিলিগ্রাম জিঙ্ক থাকে যেখানে সাধারণ চালে থাকে মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম জিঙ্ক। প্রতিদিন ৪০০ গ্রাম জিঙ্কসমৃদ্ধ চালের ভাত খেলে একজন ভোক্তা প্রতিদিন ৯ থেকে ১০ মিলিগ্রাম জিঙ্ক পেতে পারে। পুষ্টির চাহিদা পূরণে জিংকসমৃদ্ধ ধান চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। কৃষকরা জিংকসমৃদ্ধ ব্রি ধান ৬৪, ব্রি ধান-৭৪, ব্রি ধান-৮৪ এবং ব্রি ধান-১০০ আবাদ করেছেন ফলনও হচ্ছে ভালো।

ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। অন্য পুষ্টিকর খাবার জোগাড় করতে না পারলেও দুই বা তিনবেলা ভাতের সংস্থান এখন প্রায় সবারই সামর্থ্যের মধ্যে। তাই ভাতের মাধ্যমে কীভাবেপুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা যায়, সে লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৩ সালে বিশ্বের সর্বপ্রথম জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত ব্রি ধান-৬২ উদ্ভাবন করে। এরপর একে একে ব্রি ধান- ৬৪, ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৪, ব্রি ধান-৮৪ এবং সর্বশেষ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে উচ্চ জিঙ্ক ব্রি ধান-১০০ অবমুক্ত করে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ব্রি উদ্ভাবিত শততম জাতের (ব্রি ধান-১০০) অবমুক্তকরণ করে। ব্রি বলছে, ব্রি ধান-১০০ জাতটি উচ্চ পরিমাণে জিংকেসমৃদ্ধ। এতে জিংকের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ২৫ দশমিক ৭০ মিলিগ্রাম। দেশের ১০টি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবেআবাদ করে এই ধানের গড় ফলন পাওয়া যাচ্ছে হেক্টরে ৭ দশমিক ৬৯ টন। জাতটির জীবনকাল ১৪৮ দিন। বোরো মৌসুমে চাষের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এই সুপার জাতটি।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জিঙ্কসমৃদ্ধ বিনাধান-২০ নামের ধানের জাত এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৭ সালে বারি গম ৩৩ উদ্ভাবন করেছে। সরকারের উৎপাদন গতিশীলতার এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালে চালের উৎপাদন হবে৪ কোটি ৭২ লাখ টন। বিপরীতে ২০৫০ সালে সাড়ে ২১ কোটি মানুষের খাদ্যচাহিদা পূরণে চাল প্রয়োজন হবে৪ কোটি ৪৬ লাখ টন। অর্থাৎ, গত পাঁচ বছরের চালের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালে দেশে ২৬ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে। স্বাস্থ্য খাতে অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। জিংক ধান আপাতত টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্য- যা সামনে রেখে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করছেন দেশের কৃষি গবেষকরা।

জিংকের অভাবেশিশুদের ক্ষুধামন্দা হচ্ছে। বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ, মা ও শিশুর জন্য জিংক এবং আয়রন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শরীরে জিংকের ঘাটতি হলে রোগ প্রাতরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। জিংকের অভাবেপ্রাপ্তবয়স্ক নারীর বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে।

Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ১৬-০৯-২০২২ (পৃঃ ০৮)

ধান ছড়াবে সুগন্ধি তাড়াবে পোকাও

> ব্রির সফলতার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে সুগন্ধি ও পোকা প্রতিরোধী ধানের জাত। এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে শুধু ধান নয়, অন্য যেকোন ফসলেও প্রয়োগ করতে পারব’
>
> -ব্রির মহাপরিচালক

প্রতিনিধি, তারাকান্দা (ময়মনসিংহ)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীরা ধানের জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে ধানের গুণগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন ও ধানের মধ্যে পোকা প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরিতে সফল হয়েছেন। তাদের এ সফলতার ফলে এখন এ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে যেকোন ধান সুগন্ধি ছড়াবে। শুধু তাই নয়, ধানের বড় শত্রু মাজরা পোকা ও বাদামি ঘাসফড়িং (কারেন্ট পোকা) প্রতিরোধ করতে পারবে।

ব্রি বিজ্ঞানীদের এই সফলতার মূলে রয়েছে ‘ক্রিসপার ক্যাস-৯’ পদ্ধতির ব্যবহার। এটি মূলত একটি জিনোম এডিটিং টুলস বা ফসলের জিন পরিবর্তনের আধুনিক ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটি প্রযুক্তি।

ব্রির বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সব ধানেই সুগন্ধি বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু টুএপি (২-এসিটাইল), (১ পাইরোলিন) সক্রিয় থাকলে সুগন্ধি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হতে পারে না। ধানে বিএডিএইচটু জিন সক্রিয় থাকলে এটি টুএপি উৎপাদন ব্যাহত করে। ক্রিসপার ক্যাস-৯ পদ্ধতিতে টুএপি জিনটি নিষ্ক্রিয় করে অধিক ফলনশীল যেকোনো ধানের জাতে সুগন্ধি বৈশিষ্ট্য যোগ করা যায়।

একই পদ্ধতিতে ধানগাছে সেরোটোনিন উৎপাদন ব্যাহত করে ধানের প্রধান অনিষ্টকারী পোকা বাদামি ঘাসফড়িং ও মাজরা পোকা প্রতিরোধী ধানের জাত উৎপাদন করা যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কীটতত্ত্ববিদ ড. মো. পান্না আলীর নেতৃত্বে একদল গবেষক ক্রিসপার ক্যাস-৯ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুগন্ধি ও পোকা প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশ করে ধানের ২৪টি গাছ পেয়েছেন। তারা জানান, এ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ২০২০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান জার্মানির বিজ্ঞানী ইমান্যুয়েল চাপেনিয়ার ও আমেরিকার জেনিফার দোদনা। এরপর থেকেই ফসলের জাত উন্নয়নে কৃষিবিজ্ঞানীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় ক্রিসপার ক্যাস-৯ প্রযুক্তি।

আর তখন থেকেই ড. মো. পান্না আলীর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী ক্রিসপার ক্যাস-৯ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

ড. মো. পান্না আলীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় সুগন্ধি ও পোকা প্রতিরোধী ২৪টি গাছ পেয়েছি। ক্রিসপার ক্যাস-৯ প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে গাছগুলো পাওয়া গেছে, সে ধানের শিষগুলো পাকতে শুরু করেছে। আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে বীজ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। এ সফলতায় আমরা দারুণ আনন্দিত ও উজ্জীবিত।

সম্প্রতি এ ২৪টি গাছ পরিদর্শন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবির। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ব্রি উচ্চ ফলনশীলসহ বিভিন্ন প্রকার ধানের ১০৬টি জাত উদ্ভাবন করেছে। ক্রিসপার ক্যাস-৯ পদ্ধতি ব্যবহার বাংলাদেশের জন্য মাইফলক। সফলতার ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে সুগন্ধি ও পোকা প্রতিরোধী ধানের জাত।

ব্রির মহাপরিচারক বলেন, ‘এটি ব্রির একটি যুগান্তকারী সফলতা। এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আমরা যেকোন কাঙ্ক্ষিত গুণাগুণ শুধু ধান নয়, অন্য যেকোন ফসলেও যোগ করতে পারব।’

Sangbad Online
সংবাদ

তারিখঃ ১৬-০৯-২০২২ (পৃঃ ০৮)

বৈশ্বিক অস্থিরতা ও কৃষি ভাবনা

সত্যেন মণ্ডল

মায়ানমার থেকে রাশিয়া পর্যন্ত, ইউরোপ-আমেরিকা সর্বত্র কেমন যেন অস্থিরতা বিরাজ করছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব, সারা দুনিয়ায় যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মুল্য লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে, তখন বলতেই পারি আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হিমশিম খাচ্ছি। বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার একটি বড় কারণ বিশ্বের অন্যতম খাদ্য উৎপাদনকারী দুটি দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেন এর মধ্যে যুদ্ধ।

বিশ্বায়নের কৃষি বাজারের প্রেক্ষাপটে-বিশ্বব্যাপী কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এমন পরিস্থিতি পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। যুদ্ধের গত কয়েকমাসে যেসব পরিণতিগুলো স্পষ্ট, সেগুলো হলো- ইউক্রেন থেকে রপ্তানি স্থবির হয়ে পড়েছে, ভবিষ্যতের ফসল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, বিশ্বব্যাপী কৃষিপণ্যের দাম বেড়েছে এবং সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে আছে সেই দেশগুলো যারা ইউক্রেন এবং রাশিয়া থেকে কৃষিদ্রব্য বা খাদ্য আমদানির উপর নিভ্রশীল।

বর্তমানে কৃষি বাজারের অস্থিরতার বড় কারণ হলো যুদ্ধ, যা একই সময়ে চূড়ান্ত কৃষিপণ্য এবং কৃষি উপকরণের বাজারকে ব্যাহত করছে। গম এবং তৈলবীজের মতো কৃষি ফসলগুলো হলো রুটি এবং ভোজ্যতেলের মতো প্রধান খাবারের উপাদান, যা সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য ক্যালোরির প্রাথমিক উৎস। বর্তমান সময়ে খাদ্য উৎপাদনে রাসায়নিক সারের প্রভাব ধনী দেশগুলোর পাশাপাশি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর বিকল্প উপায়গুলোকে সীমিত করেছে। যেহেতু বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা রাশিয়া এবং বেলারুশ থেকে সার আমদানি করাকে সীমিত করেছে, ফলে আমাদের দেশ সহ অনেক দেশে সারের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সে কারণে কৃষি উৎপাদনে প্রভাব পড়ছে ও খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে। এতো গেলো খাদ্য নিরাপত্তার উপর মনুষ্য সৃষ্টি যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার প্রভাব, এবার আসা যাক প্রকৃতির খেয়ালিপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কথায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের ধরনে আমূল পরিবর্তন এসেছে, ফলে এ বছর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেও কৃষকদের সেচ দিয়ে আমন ধানের বীজতলা তৈরি করতে দেখা গেছে, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে। বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চল এর মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ত। তার মধ্যে ৬.৫ লক্ষ হেক্টর বৃহত্তর খুলনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও ভোলা জেলায়, এছাড়া চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও চাঁদপুর জেলায় লবণাক্ততা রয়েছে। সাধারণত (শূন্য) ০-২ ডিএস/মিটার মাত্রার মাটিকে ???????শূন্য মাটি বলা হয়।

এছাড়া ২-৪, ৪-৮, ৮-১৫ ও ১৫ ডিএস/মিটার এর অধিক মাত্রাকে যথাক্রমে স্বল্প, মধ্যম, ??????? ও অতিমাত্রার ??????? মাটি বলা হয়। বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে আমাদের এই ক্রম-হ্রাসমান কৃষি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের ১৬.৫১ কোটি মানুষ সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই পরিবর্তনের কারণে, বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও খরার মত ঘটনা ঘটছে। যার কারণে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২১.৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বন্যা বা অতি বর্ষনের ফলে প্রায় ২৩.৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধানের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ছোট-বড় ৯৩টি দুর্যোগের কবলে পড়ে বাংলাদেশ। এ সময়ে এ দেশের কৃষি ও অবকাঠামো খাতে ৫৯০ কোটি ডলারের ক্ষতি হয়। এছাড়া ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশেষ করে বন্যার কারণে ১,০৬,৩০০ হেক্টর আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা অল্প হলেও বাড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন স্থানে পানি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। বঙ্গোপসাগরের লোনা পানিতে এর মধ্যে ৮ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর আবাদি জমি লবণাক্ত হয়ে গেছে। জাতিসংঘের ইন্টার-গভর্নমেন্ট প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) এর মতে ২১০০ সালের অনেক আগেই আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সমুদ্রের পানির উচ্চতা এক মিটার বেড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

> জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের ধরনে আমূল পরিবর্তন এসেছে, ফলে এ বছর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেও কৃষকদের সেচ দিয়ে আমন ধানের বীজতলা তৈরি করতে দেখা গেছে

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ জমি লবণাক্ত পানি দ্বারা তলিয়ে যাবে,এতে ১৩ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার পরিমাণ প্রায় দুই কোটি। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল পানির নিচে ডুবে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ অঞ্চলের কৃষি ও পরিবেশ। ফলে উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে এ অঞ্চলের অগনিত মানুষ। এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও ঘনত্ব বাড়বে। সিডর আইলা ও নার্গিসের মতো ঘুর্নিঝড় আগে ১০ থেকে ১৫ বছর পর পর আসত। এখন প্রায় প্রতিবছর আসছে এবং এগুলোর গতিও বাড়ছে।

এক সময় ছিল, আমাদের দেশের কৃষকরা চাষাবাদের সময়সূচি সম্পর্কে একটা পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারত, শস্য বিন্যাস ছিল তাদের অনেকটাই নির্ধারিত। এখন সবই অনিয়শ্চতায় ভরা। তাদের প্রচলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আর তেমন কাজে লাগছে না। ফলে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হচ্ছে আমাদের কৃষি খাত। অন্যদিকে আশংকা করা হচ্ছে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বৃষ্টিপাত ৪-৫% কমে যাবে ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরা এলাকা আরও বাড়বে।

কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ। দেশে সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে সকলকে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ও স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাত উদ্ভাবন, জাতগুলোর বীজ বর্ধন এবং কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা বর্তমান পেক্ষাপটে অতি আবশ্যক। সে লক্ষ্যে বিআরআরআই লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৯৭, ব্রি ধান৯৯ (বোরো), ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪ ও ব্রি ধান৭৩ (আমন) ও খরা সহিষ্ণু ব্রি ধান৫৬ ও ব্রি ধান৫৭ উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশের এ পর্যন্ত ১৮৬ টি ধানের জাতের জিনোম সিকোয়েন্স করা হয়েছে। যেটা করতে সাহায্য করেছে 'বেইজিং জিনোমিক্স ইনস্টিটিউট' চীন। এই তথ্য ব্যবহার করে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা হয়তো আরও ভালো ভালো উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবেন।

শস্য বহুমুখীকরণ বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ কর্মসূচি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। বিগত ২০০৯-২০১৯ সালে ক্রপিং ও ফার্মিং সিস্টেমের উপর ব্যাপকভাবে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এসব কাজের ধারাবাহিকতায় সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ হাতে নিচ্ছে যাতে দানাদার ফসল, তেলজাতীয় ফসল, শাক-সবজি, ফলমূল, হাঁস-মুরগি পালন, পুকুরে মাছ চাষ ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যারা কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবিদ আছি সকলে মিলে আমাদের পরীক্ষালব্দ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এ দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য উজাড় করে দিতে হবে।

[**লেখক :** সহকারী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর]